মোদী রাজত্বে বিপন্ন দেশের সার্বভৌমত্ব

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

গত পাঁচ বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর কিছু করতে পারুন অথবা না পারুন বিশ্বের ৫৫টি দেশ ভ্রমণ করেছেন, যার জন্য সরকারের ভাঁড়ার থেকে খরচ হয়েছে ২০২১ কোটি টাকা। তুলনায় তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর ১০ বছরের সময়কালে ৩৮টি দেশ সফর করেছিলেন। সরকারের খরচ হয়েছিল ১,২৪৬কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর ভ্রমণে যে খরচ তার মধ্যে রয়েছে বিমানভাড়া, বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হটলাইন বাবদ খরচ। এছাড়া তাঁর ভ্রমণের সময় প্রচারের ঢক্কানিনাদে যা খরচ হয়েছে তা এর মধ্যে ধরা নেই।

মোদীজীর হয়ে যাঁরা জনসংযোগের দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা এই ব্যাপারটি খেয়ালে রেখেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের বিষয়ে যা প্রচার করা হবে তা থেকে যেন মানুষের মনে এ ধারণা হয় যে নরেন্দ্র মোদীজী একজন প্রচণ্ড পরিশ্রমী প্রধানমন্ত্রী – যাঁর কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে নিজের দেশের সম্মান উজ্জ্বল করা। খবরের কাগজে, টেলিভিশনে, সোশাল মিডিয়ায় এমনভাবে তাঁর ভাবমূর্তি তৈরি করা হলো যেন নরেন্দ্র মোদী গোটা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে সক্ষম, চীনের বিরুদ্ধে পালটা ভারসাম্যের শক্তি হিসাবে ভারতকে তুলে আনতে পারবেন তিনি – যা সব থেকে বেশি স্বার্থরক্ষা করবে আমেরিকার।

মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের ভিতরে গরিব ও মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে তাঁর বিদেশ সফরের সময়ে তাঁকে নিয়ে বিদেশের মাটিতেই লেসার রশ্মি দিয়ে রক ব্যান্ডের আসর বসেছে, অনাবাসী ভারতীয় বিউটি কুইনরা আসর আলো করেছেন, কিছু কবিকে দেশ থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মোদীজীর গুণকীর্তন করার জন্য।

নরেন্দ্র মোদীজী তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের সুচনা করেছিলেন এমনভাবে যেন মনে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি এক নতুন ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চান। ২০১৪ সালে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশগুলির সকল রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেদিন নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে কে না আসেননি? শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মহিন্দা রাজপক্ষ, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিঙ টোবগে, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কৈরালা, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিন আব্দুল গাইয়ুম। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। একমাত্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। সেদিন এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যে নরেন্দ্র মোদী শুধু ভারতেরই নন তিনি এই উপমহাদেশের নেতা। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

আজ যখন নরেন্দ্র মোদী সরকারের পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তখন এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠবে তাঁর সরকারের বিদেশনীতি আসলে কী এবং কতটা সফল? এর দ্বারা ভারতের স্বার্থ কতটা রক্ষিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের সম্মানই বা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোন একটি দেশের পররাষ্ট্র নীতি সে দেশের আভ্যন্তরীণ নীতিরই প্রতিফলন। ভারতের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন বিদেশনীতিই ছিল ভারতের প্রধান লক্ষ্য, কারণ একমাত্র স্বাধীন বিদেশনীতির মাধ্যমেই ভারতের স্বার্থকে সব থেকে ভালভাবে রক্ষা করা যায় একথা সেদিনের ভারত রাষ্ট্রের নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৫০ সালে ভারত যে জোট নিরপেক্ষতার বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিল, তা ভারতের পক্ষে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়েছিল। বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুনিয়াজোড়া উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোগী ছিল ভারত এবং উপনিবেশ অবসানের ব্যাপকতম প্রচারে ভারত অংশ নিয়েছিল। দু' দশকের মধ্যে ১০০টিরও বেশি উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ ও নির্ভরশীল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

এই উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ভিত নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল এক নিঃস্বার্থ বিরাট ভূমিকা। সেই সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও ভারতসহ অন্যান্য সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে এক নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে কারণে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিশ্বের একজন সম্মানীয় রাষ্ট্রনেতা বলে গণ্য হন।

কিন্তু আজ, বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকারের পাঁচ বছর যখন পূর্ণ হতে চলেছে, তখন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এই সরকার স্বাধীন বিদেশনীতির জলাঞ্জলি দিয়েছে। সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ছিল আমাদের বিদেশনীতির একটি স্তম্ভ, তাকে বরবাদ করে ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ জুনিয়র পার্টনারে পরিণত করাই ছিল মোদী সরকারের ধ্যানজ্ঞান।

একথা ঠিক গত চার দশকে বিশ্ব পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর অস্তিত্ব নেই। বিশ্বে দ্বি-মেরু ব্যবস্থা আজ আর নেই। শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে।

তাই অনেকে যুক্তি দেন যে বর্তমান বিশ্বে জোটনিরপেক্ষতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন কোন বিদেশনীতি গ্রহণ করলে ভারতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে বিশ্বে একমেরুর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, অর্থাৎ দুনিয়ায় তারই একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে। অপর দিকে নতুন করে দ্বিমেরু ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুমেরুর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে শক্তির ভরকেন্দ্র একটি দেশের উপর থাকবে না – ছড়িয়ে থাকবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১৫০টিরও

বেশি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে, প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা রয়েছে তাদের পছন্দমত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। যদিও আমেরিকা তার একাধিপত্য কায়েম করতে উদ্যোগী, তবু তাদের সেই উদ্যোগকে প্রতিহত করার মতো শক্তি পৃথিবীতে আছে, সেইসব বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে একত্র করার প্রয়োজনও আছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার বিরোধ এতকাল যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিরাট না হলেও তা নেই।

মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে ইউ পি এ সরকার যতদিন বামপন্থীদের সমর্থনে চলছিল ততদিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক এই বহুমেরুর ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে বেশকিছু উদ্যোগ 'ব্রিকস' (অর্থাৎ ব্রাজিল, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া) গঠনে ভারতের সক্রিয় উদ্যোগ ছিল। কিন্তু মোদী সরকারের পাঁচ বছরে সেইসব উদ্যোগের ছিটেফোঁটাও লক্ষ্য করা যায়নি। চীনের উদ্যোগে যে ''ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড'' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে পুরানো সিল্ক রুটের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং একে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটবে, কিন্তু ভারত এবং ভূটান এই দুটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ এই প্রকল্পে যুক্ত হয়নি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খুশি রাখতেই এ সিদ্ধান্ত। চীন যে এশিয়ান ইনফ্রাস্টস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করছে, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো মার্কিন ঘনিষ্ট দেশগুলিসহ ৬০টির বেশি দেশ যোগ দিয়েছে, কিন্তু ভারত এ বিষয়ে উৎসাহ দেখায়নি।

সম্প্রতি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একই সঙ্গে হয়েছিল পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিধর জি-৭ গ্রুপের বৈঠক। দু'টি বৈঠকের খবরই বিশ্ববাসী দেখেছেন। যেখানে জি-৭ এর বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকার আচরণে অপরদিকে সাংহাই কো-অপারেশনের বৈঠক আরো সংহত হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান এর পূর্ণ সদস্য হয়েছে। পাশাপাশি লাতিন আমেরিকায় UNASUR, MERCOSUR, ALBA, CELAC-এর মতো আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়া আমেরিকার মধ্যে সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। রাশিয়া সিরিয়াতে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের কোণঠাসা করেছে। অপরদিকে চীন-রাশিয়া সম্পর্ক আরো সংহত হয়েছে, বিভিন্ন বহুদেশীয় মঞ্চগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য ঐ দুই দেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং আমেরিকা যেভাবে একমেরুর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও শুরু হয়েছে। ভারত সেই প্রতিরোধে শামিল হতে পারত, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সরকার হেঁটেছে উলটো পথেই।

বস্তুত ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পশ্চিমের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। প্রথম ইউ পি এ সরকারই ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তিতে সই করে। বামপন্থীরা এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং বামপন্থীরা ইউ পি সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নেয়।

উল্লেখ্য, আজ আমাদের বিজ্ঞানীরা যেসব রকেট ও স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করছেন, তার পিছনে আছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিভা, কোন বিদেশী সহযোগিতার ভিত্তিতে এই সাফল্য আসেনি।

আসলে বিশেষ করে ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে যে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে তার থেকে বেরোন'র কোনও রাস্তা বিশ্ব পুঁজিবাদ দেখাতে পাচ্ছে না। নয়া উদার আর্থিক নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়াজুড়ে সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আরও বাড়াতে চাইছে। নয়া উদারনীতির এই সংকটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে বড় অঙ্কের আর্থিক সম্পদ আছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে। তাদের বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হলো এক মেরুর বিশ্ব গড়ে তোলা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো-র সামরিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিত্বে ২০১৮ সালে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। সামরিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব সামরিক কৌশলের নজর ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়, সেখানে মার্কিন নৌবহরের দুই তৃতীয়াংশ মোতায়েন আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান লক্ষ্যই হলো দক্ষিণ চীন সাগরে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে সেদিকে নজর রেখে ঐ অঞ্চলে চীনকে নিয়ন্ত্রণ করা—কারণ আমেরিকার বিশ্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দ্রুত উঠে আসছে চীন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন জেরুজালমেই হবে ইজরায়েলের রাজধানী এবং তাই তেল আবিভ থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়ে আসা হবে। এ ঘটনা থেকে পরিস্কার ইজরায়েল যেভাবে প্যালেস্তাইনের ভূখণ্ড জবরদস্তি দখল করে রেখেছে মার্কিন প্রশাসন তাকেই বৈধতা দিচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে বলা আছে যে স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের রাজধানী পূর্ব জেরুজালেম – গোটা বিশ্ব তা স্বীকারও করে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে ইজরায়েলে-প্যালেস্তাইন বিরোধ মীমাংসার কোন ইচ্ছা ট্রাম্প প্রশাসনের নেই, বরং তারা ঐ অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াতে চায়। সম্প্রতি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা সীমান্তে ৬০ জন প্যালেস্তানীয়কে হত্যা করেছে। জেরুজালমে ইসরায়েল তার বসতি বাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে বর্তমান ভারত সরকারের অবস্থান কী? মোদী সরকারের আমলে আমেরিকা- ইজরাইলমুখী ভারত আর আগের মতো প্যালেস্তাইনের পাশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংহতি জানায়নি। আজ ইজরায়েলের থেকে প্রতিরক্ষাগত সাহায্য ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার মদত পেয়ে ভারত প্যালেস্তাইনকে কার্যত ভুলে গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েল সফরে গেলেও পাশেই প্যালেস্তাইনে যাননি বরং ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন তাতে আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতি ও প্যালেস্তিনীয় সংগ্রামের প্রতি সংহতির ক্ষেত্রে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গিয়েছে। অথচ সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলি থেকে আমরা ভারতবাসীরা প্যালেস্তাইনের পাশে আছি। গান্ধিজী বলেছিলেন, ''যদি ইংরেজদের ইংল্যান্ড থাকে, ফরাসীদের থাকে ফ্রান্স, তবে প্যালেস্তিনীয়দের জন্য প্যালেস্তাইন থাকবে।'' অথচ নরেন্দ্র মোদী প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের বর্বরতা ও দখলদারি নিয়ে

একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। উলটোদিকে আজ ইজরায়েল থেকেই ভারত সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনছে।

সিরিয়াতে আসাদ সরকারকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকান প্রশাসন এখন ইরানের দিকে নজর দিয়েছে। ওবামা রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যে পারমাণবিক চুক্তি হয়েছিল, ট্রাম্প প্রশাসন তা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং পুরনো কায়দায় ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছে। ভবিষ্যতে কোনও দেশ ইরানের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুললে সেই দেশকেও অবরুদ্ধ করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রেও নরেন্দ্র মোদী সরকার স্বাধীন অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারত ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করে থাকে। ২০১৭-১৮ সালে ভারত ইরান থেকে ২২.৬ মিলিয়ন টন তেল আমদানি করেছিল। এখন মার্কিন হুমকির মুখে পয়সা দিয়ে তেল কিনতেও ভারত ভয় পাচ্ছে। যদিও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারত ইরান থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখবে, কিন্তু মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেও-র বক্তব্য থেকে পরিষ্কার ভারতকে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ইরান থেকে তেল আমদানির অনুমতি দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন, কারণ ভারত ইতোমধ্যেই ইরান থেকে তেল আমদানির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়েছে। যেখানে ২০১৮ সালের মে মাসে প্রতিদিন ৬৯০,০০০ ব্যারল অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, সেখানে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে আমদানি করে প্রতিদিন ৪০০,০০০ ব্যারল তেল। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের পর মার্কিন হুমকির মুখে ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ করলে ভারতকে অন্য দেশ থেকে তেল আমদানি করতে অনেক বেশি বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হবে। ইরানের তেল রপ্তানি বন্ধ হলে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ভয়ানকরকম বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা। এমনিতেই ওপেকভুক্ত দেশগুলি তেল উত্তোলন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠছে। উদাহরণ লাতিন আমেরিকা। ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়াপ্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নির্বাচিত প্রগতিশীল সরকারগুলির স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে সক্রিয়। ব্রাজিলের মত রাষ্ট্রে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতাতেও এসেছে। অপরদিকে মেক্সিকোতে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন বামপন্থী প্রার্থী। কিন্তু লাতিন আমেরিকা আজ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র নেই।

নয়া উদারনীতির সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেও অনৈক্য দেখা দিয়েছে। ব্রেক্সিট ভোট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট বাতিল করা, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে আসা, জি-৭ বৈঠকের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করছে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানির মত দেশের সঙ্গে আমেরিকার তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এছাড়া বহু প্রশ্নে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে।

এই যখন অবস্থা অর্থাৎ বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বহু মেরুর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে, বিজেপি সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

একেবারে অনুগত প্রয়াসী। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির চাপের কাছে নতিস্বীকার করার পাশাপাশি আরএসএস এবং বিজেপি আশা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত জোটকে শক্তিশালী করতে পারলে আমেরিকা ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠনে আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য করতে পারবে।

এটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে Communication Compatibility and Security Agreement (COMCASA)-এর বিষয়ে যে আলোচনা চলছে তার মধ্যে এটি কার্যকর হলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ নিরাপত্তা বিষয়ক যন্ত্রপাতি হস্তান্তরিত করার আইনি কাঠামো তৈরি হচ্ছে, এর ফলে ভারত ও মার্কিন সামরিক বাহিনী উভয়ে তা ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে মার্কিনঘেঁষা অন্যান্য দেশের সামরিক বাহিনীর পক্ষেও ভারতের প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের ওয়াকিবহলের আশঙ্কা যে এর ফলে আমেরিকা ভারতের সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু সে আশঙ্কাকে আমল না দিয়ে মোদী সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধঃস্তন সহযোগী হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। এর আগে একটি কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়, যার নাম Logistic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), যেখানে ভারতকে আমেরিকায় একজন 'প্রধান সহযোগী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা কেন্দ্রগুলিতে আমেরিকা ঢোকার সুযোগ পাবে এবং মার্কিন সামরিক বাহিনী যখন সার্বভৌম, স্বাধীন দেশগুলির উপর হস্তক্ষেপ করবে, ভারত তখন তাদেরকে যুদ্ধের কৌশলগত ও বস্তুগত সবরকম সাহায্য করবে। গত ২০১৭ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে রাজ্যসভায় সিপিআই(এম) সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন, 'এই চুক্তি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। চুক্তিতে কী শর্ত আছে আমাদের জানা নেই। ভারতীয় সংসদে এটি পেশ করা হয়নি, কিন্তু ২০১৭ সালের National Defence Authorisation Act অনুযায়ী এটিকে মার্কিন সেনেটে পাশ করা হবে।'' একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সেদিন সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, ''ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী চুক্তির ১৯(৯) ২ ধারায় বলা হয়েছে, ''ভারতে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়ানো হবে যাতে দক্ষিণ এশিয়া এবং বৃহত্তর ভারত-এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।'' সীতারাম ইয়েচুরি সেদিন বলেছিলেন, ''এই 'এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' কথাটার দিকে লক্ষ্য করুন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা আমাদের এই প্রতিবেশী এলাকায় আজ আমেরিকার জুনিয়র পার্টনার। আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতির কফিনে শেষ পেরেক এভাবেই পোঁতা হয়েছে।''

তবে এ কথাও সত্যি যে আমাদের দেশের মার্কিন সরকারের হয়ে তাঁবেদারি করা, তাদের হয়ে পোঁ ধরার মত মানুষের অভাব নেই। আমেরিকা যেন বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ! অথচ এই একা দেশ যারা দুনিয়াজুড়ে ১৩২টি দেশের ৭০২টি সামরিক ঘাঁটি থেকে গোটা দুনিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কায়েম করতে সক্রিয়। বলা হয় সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আমেরিকার হাত ধরা দরকার। সন্ত্রাসবাদকে অবশ্যই পর্যুদস্ত

করতে হবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। কিন্তু এরই পাশাপাশি ভুলে গেলে চলবে না এই আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনী সিআইএ চিলির নির্বাচিত বামপন্থী আলেন্দেকে হত্যা করে তাঁর সরকারকে উৎখাত করেছিল। একটি বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করতে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে ১০,০০০ জনকে হত্যা করেছিল। এরকম ঘটনা অনেক।

এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা খোলা গলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হয়ে ওকালতি করেন, আবার আরেকটি অংশ আছেন যাঁরা এমনকি অনেক বিষয়ে সরব কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। তাদের সবরকম অন্যায়, অত্যাচার দেখেও দেখেন না। সাম্রাজ্যবাদ যেন তাঁদের 'গেছোদাদা' – তাকে কিছুতেই ধরা যায় না। আমাদের রাজ্যে তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ধরুন। জগৎ সংসারে এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি বলতে কসুর করেন না, বিজেপি'র বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লোক দেখানো হুংকার ছাড়তেও তিনি দ্বিধা করেন না – অথচ সাম্রাজ্যবাদের বিষয়ে তাঁর বরাবরের জন্য মুখে কুলুপ। অবশ্য তা হবে নাই বা কেন? সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই মার্কিন মুলুক থেকে খোদ মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হিলারি ক্লিন্টন এসেছিলেন কলকাতার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। মার্কিন প্রশাসনের তথা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাত যে কোন্ দিকে তা এঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপরেও মুকেশ আম্বানির কন্যার বিবাহেও হিলারি ক্লিন্টন, নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলন হয়েছে। তৃণমূল সরকার কেবল দেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীলদেরই নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও আশীর্বাদপুষ্ট। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীজির পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে একটা কথাও বলেন না, সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করা তো দূর অস্ত।

তবু বামপন্থীরা কখনও একথা বলেনি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখা যাবে না। তা মোটেই নয়। প্রতিটি দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কিন্তু নিজের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থে, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে নয়, আত্মসম্মান বিক্রি করে নয়।

বর্তমানে এমন কোনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নেই যেখানে মোদী সরকার সরাসরি ১০০ শতাংশ বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়নি – এর মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদনও রয়েছে। এইসব বিদেশী পুঁজি ভারতে আসবে, নিজেদের মুনাফা বাড়াবে এবং নিজের দেশে নিয়ে যাবে এটাই এখনকার সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদী সরকার যে নোটবন্দী করেছিল এবং জিএসটি চালু করেছে, তার উদ্দেশ্যই ছিল দেশী এবং বিদেশী পুঁজির মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া। একই সঙ্গে ভারতের বিপুল খনিজ সম্পদ তোলার জন্যও বিদেশী বহুজাতিকদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ধান্দার অর্থনীতিই মোদী সরকারের অনুসৃত নীতি। তৃণমূল সরকারেরও তা-ই।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার ভাব দেখিয়েছিল যে এই উপমহাদেশের কূটনীতিকে ভারতই নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু গত ৫ বছরে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সহজ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে জটিল হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'ভাবমূর্তি'

যে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে কাজ করছে একথা বলা যাবে না। উদাহরণ ভূটান। তারা ভারতকে "শুধু উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে নয়, সব থেকে বড়ো বিনিয়োগকারী ব্যবসায়িক সহযোগী হিসাবে দেখতে চায়।" ২০১৮ সালে ভারত বিপজ্জনকভাবে ডোকলামে একটি ছোটখাটো সামরিক অভিযান চালায়। ভূটান ও চীনের মধ্যে একটি বিতর্কিত এলাকা এই ডোকলাম। আসলে ভূটানের উপর থেকে চীনের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যেই এই অভিযান ছিল। যাই হোক সমস্যাটি মিটেছে এবং উভয় পক্ষের দাবি যে জয় তাদেরই হয়েছে।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা নদীর জলবন্টন সংক্রান্ত সমস্যাটি বদ্ধাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে এবিষয়ে ইউপিএ সরকার ও হাসিনা সরকারের মধ্যে তৈরি হওয়া খসড়া চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। সমস্যাটির সমাধানে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কার্যকরী উদ্যোগ নেয়নি। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে মায়নামার সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধকে ভারত সরকার কার্যত আমল দেয়নি। বরং আন্তর্জাতিক বিধিতে যে মানবিকতা প্রদর্শনের কথা, তা-ও লঙ্ঘন করেছে।

নরেন্দ্র মোদীর বিদেশনীতির আরেকটি লক্ষ্য হলো দেশের ভিতরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে বাজার গরম করা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিকাল স্ট্রাইকারে নামে প্রচারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হলো – যেখানে প্রধানমন্ত্রীর 'সাহসী পদক্ষেপের' জয়ধ্বজা ওড়ানো হলো – বোঝাই যায় কৌশলগত সাফল্যের থেকেও দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সুবিধা তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। হঠাৎ, আচমকা নাটকীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চটকদারী রাজনীতির যে নমুনা নরেন্দ্র মোদী রেখেছেন (বিমুদ্রাকরণ তার জ্বলন্ত উদাহরণ), হঠাৎই সেরকম খবরের কাগজের হেডলাইন পাবার উদ্দেশ্যেই তিনি হঠাৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিকের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

আজ যখন লোকসভা নির্বাচন আসন্ন তখন এদেশের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে এ প্রশ্ন তোলার যে মোদী সরকারের মার্কিনমুখী বিদেশনীতি দেশকে কোন সুফল এনে দিয়েছে? বস্তুত এই সরকার যেখানে স্বাধীন বিদেশনীতির জলাঞ্জলি দিয়েছে, দেশকে সাম্রাজ্যবাদের অধঃস্তন সহযোগীর পর্যায়ের নিয়ে গেছে – তাতে দেশের সামনে এবং দেশের সার্বভৌমত্বের সামনে বড় বিপদের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বিপদ ভারতের সার্বভৌমত্বের, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে বি জে পি'কে হটানোই জরুরী কর্তব্য।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

দাম : ৫ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক মুজফ্ফর আহ্মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।